Vol. 34 | No. 3 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

গ্রন্থ-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ

Volume	34
Issue	3
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রফিকউল্লাহ খান
Published online	June 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i3.4
Pages	57-78
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-সমালোচক রবীন্দ্রনাথ

রফিকউল্লাহ খান

এক

কবি-পরিচয়ে বিশ্বখ্যাত হলেও সাহিত্যসমালোচক রবীন্দ্রনাথ কবি রবীন্দ্রনাথেরই সমবয়সী। 'কবিতার তুলনায় গদ্যরচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রবীণতা প্রথম'[১] থেকেই যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো, তা স্বতঃসিদ্ধ। অনুভব (emotional impulse) থেকে অনুভাবে (emotional experience) উত্তরণের যে অন্তর-বাহিরের সাধনা সমগ্র রবীন্দ্র-জীবনে ও সৃষ্টিতে বিধৃত, সাহিত্যসমালোচনায় ঘটেছে তার বহুভঙ্গিম ও বিচিত্র-জটিল অভিব্যক্তি। হৃদয়াবেগের সাথে বহির্জগতের তরঙ্গ-সংঘাতের আন্তরক্রিয়ার বহুবর্ণিল ও ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু মননবৃত্তির সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় তাঁর যে স্বনিষ্ঠ প্রয়াস, সেখানে কবি থেকে শিল্পীতে, শিল্পী থেকে কর্মীতে রূপান্তরপ্রবণ চলমান রবীন্দ্র-প্রতিভার অন্তরধর্মই যেন ক্রিয়াশীল। পনেরো-ষোলো বছর বয়সের কিশোর রবীন্দ্রনাথ রচিত কবিতার যে প্রথানুগত্য, ঐ সময়ে রচিত প্রবন্ধ-সমালোচনায় তা বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার-বঙ্কিমচন্দ্রসৃজিত বাংলা গদ্য-সমালোচনার ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গোড়া থেকেই যে স্বাবলম্বন প্রত্যাশী ছিলেন, *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর সমালোচনা কিংবা *য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র* পাঠেই তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। রেনেসাঁসের জীবনধর্ম ও শিল্পমূল্যমানে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের এই সমকালস্পন্দিত স্রষ্টাচৈতন্য বাংলা গদ্যের ধারায় কালান্তরের ইঙ্গিতবাহী।

রবীন্দ্র-সৃষ্টির বিচিত্র বিপুল পটভূমিতে সাহত্যমসালোচনামূলক রচনার প্রাচুর্য বিস্ময়কর। *চিঠিপত্র* কিংবা *জীবনস্মৃতি*তেও এ-সংক্রান্ত প্রবাদপ্রতিম উচ্চারণ অনায়াস-লব্ধ। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-আলোচনা আমার অন্বিষ্ট। রবীন্দ্র-নাথের জীবনবোধ, সাহিত্যাদর্শ ও বিচারশক্তির নিপুণ প্রয়োগে তাঁর গ্রন্থ-সমালো-

চনাসমূহ অনবদ্য। এর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রপ্রতিভার যে রূপ ও স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে, তার সমকক্ষ দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে বিরল। 'আকস্মিক দৈবী-প্রেরণায় কাব্যরচনা যদি-বা সম্ভব, সমালোচনা নয়। সমালোচনার শক্তি মার্জিত, শিক্ষিত, পরিশীলিত।'[২] বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, গোড়া থেকেই মার্জনা, শিক্ষণ ও পরিশীলন ক্ষেত্রের কঠিনের সাধনায়ই রবীন্দ্রনাথ অর্জন করেছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত গতিবেগ, তাঁর জীবনদৃষ্টি ও শিল্পবীক্ষা পরিণত হয়েছিলো প্রাচ্য-পাশ্চাত্য জীবনানুভব ও সাহিত্যাদর্শের মিলনভূমিতে। ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকার প্রকাশ সূত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধরচনার সূচনা। 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তামূলক প্রথম প্রবন্ধ—বস্তুত তাঁর প্রথম প্রকাশিত গদ্যরচনা—প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সাহিত্যচিন্তামূলক প্রবন্ধের মাত্র চার বছর পরে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে।'[৩] সুতরাং সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য তেমন কোনো দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের সামনে ছিলো না। গদ্যের একটা রূপ হয়তো গড়ে উঠেছিলো, কিন্তু সাহিত্যবিচারের পদ্ধতি ও শৈলী রবীন্দ্রনাথকেই উদ্ভাবন করতে হয়েছিলো।

দুই

সাহিত্যসমালোচক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ গ্রন্থ-আলোচনা সূত্রেই। ১২৮৩ (১৮৭৬) সালে *জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব* পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় *ভুবন-মোহিনী-প্রতিভা, অবসর-সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী* নামক সদ্য প্রকাশিত তিনটি কাব্যগ্রন্থের আলোচনার মধ্য দিয়ে সমালোচক রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ ঘটে। গ্রন্থ তিনটি যথাক্রমে নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় ও হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী রচিত। কিশোর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধের দৃষ্টান্ত হিসেবে আলোচনার অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হলো :

> মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি। যখন প্রেম, করুণা, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তিসকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয়, তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্য রূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত সেই স্রোত হয়ত শত শত মনোভূমি উর্বর করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বর্তমান থাকিবে।[৪]

উদ্ধৃত অংশে বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও ভাষারীতির যে প্রয়োগ ঘটেছে, সামসময়িক বাংলা গদ্যের পটভূমিতে তা তুলনারহিত। উক্ত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার লক্ষণ ও স্বরূপ, মহাকাব্যের সাথে তার পার্থক্য প্রভৃতি আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করেন। সুকুমার সেনের মতে, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচনা বিভাগে চৌদ্দ পনেরো বছরের বালকের লেখা এই প্রবন্ধের ঐতিহাসিক মূল্য তো আছেই,

ইহার নিজস্ব মূল্যও উপেক্ষণীয় নয়।'[৫] অন্য আরেকজন সমালোচক, ভবতোষ দত্ত, এই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে বলেন, 'যদিও রবীন্দ্রনাথ তখন চোদ্দ-পনেরো বৎসরের কিশোর তবু এই প্রবন্ধে তিনি গীতিকাব্যের যে লক্ষণ নির্ণয় করলেন, বলতেই হবে সমসাময়িক সাহিত্যের আদর্শে তা কিছুটা দুঃসাহসিক।'[৬] গীতিকবিতার প্রতি এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির মূলে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক গীতিকবিধর্মী শিল্পী-চৈতন্য। রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রসৃজিত বাংলা কব্যের যে ধারা তখন পর্যন্ত বিরাজমান ছিলো, তা ক্লাসিক আদর্শবাহী মহাকাব্যনির্ভর। বিহারীলালের গীতধ্বনি তখনও অস্পষ্ট, ক্ষীণশ্রুত। ইউরোপীয় রোম্যান্টিক কবিমানস বহু আগেই কবিতার রূপবন্ধ হিসেবে মহাকাব্যকে বর্জন করেছিলো। সমকালমনস্ক ও বিশ্ব-প্রসারিত রবীন্দ্রচৈতন্য এ-পর্যায় থেকেই কালের দাবির প্রতি কতোটা সজাগ ও সতর্ক ছিলো, উল্লিখিত আলোচনা তার প্রমাণ।

১২৮৪ সালের শ্রাবণ মাসে *ভারতী* পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে রবীন্দ্রনাথকৃত *মেঘনাদবধ কাব্য* শীর্ষক গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। লক্ষণীয় যে, এ-আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের কবিমানস অপেক্ষা *মেঘনাদবধ কাব্যকে*ই আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সে-সময়ের ইংরেজি শিক্ষিত নব্য-ক্লাসিকপন্থী পাঠকবর্গের কাছে শেলি-কীট্স-বায়রন প্রমুখ রোম্যান্টিক কবি অপেক্ষা যেমন হোমার-মিল্টনই অধিক গ্রহণীয় ছিলো, তেমনি, রোম্যান্টিক গীতি-কাব্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে তাঁরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন নি। ক্লাসিক সাহিত্য-রূপের অনুসৃতির মধ্যেই তাঁরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেয়েছেন। 'গীতিকবিতায় সমর্পিতপ্রাণ, সাহিত্যক্ষেত্রে সদ্যঃপ্রবিষ্ট, প্রতিভাবান বালক কবি'[৭] রবীন্দ্রনাথের কাছে সমকালীন সাহিত্যের এই পরিবেশ অনুকূল মনে হয় নি।

মেঘনাদবধ কাব্য-এর সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ যেন কাল-ধর্মের প্রতিপক্ষ সাহিত্যরূপকেই আক্রমণ করেছেন। *ভারতী* পত্রিকার ভাদ্র, ১২৮৯ সংখ্যায় *মেঘনাদ-বধ কাব্য* শীর্ষক আরো একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। এ-ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির তেমন কোনো পরিবর্তন হয় নি। রবীন্দ্রনাথেরই সমবয়সী *মেঘনাদবধ কাব্য* (১৮৬১)-এর এই মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এ-পর্যায়ের রবীন্দ্রমনস্তত্ত্বের স্বরূপ অন্বেষণযোগ্য :

> এই পরিবেশে, সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে রোমান্টিক গীতিকবিতার আদর্শকে সমর্থন করা, এই ছিল সেদিনের বাঙালি রোমান্টিক গীতিকবিতার ঐতিহাসিক দায়িত্ব। পশ্চিমে যথাসময়ে এই দায়িত্বই জোরের সঙ্গে পালন করেছেন এডগার অ্যালেন পো তাঁর নতুন লিরিক কবিতার কাব্যতত্ত্ব দিয়ে। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়েই সেদিন সাহিত্যচিন্তার জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ ঘটল। এদেশে এ-যুদ্ধে তখন তিনিই সেনাপতি, তিনিই সৈনিক।
>
> এ যুদ্ধের দুটো মুখ। এক মুখে ক্লাসিক আদর্শের খণ্ডন, অন্য মুখে রোমান্টিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা। প্রত্যক্ষ দায়িত্বও দ্বিমুখী। এক. মহাকাব্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ; দুই. লিরিকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন।[৮]

কেবল বিষয়বিচারে নয়, *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরুচি, বিশ্লেষণপদ্ধতি এবং অধ্যয়ন-পরিধির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিঃসন্দেহে বাঙালি-চেতনার বিশ্বপ্রসারিত সাহিত্যবোধের দিক্‌নির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য। *মেঘনাদবধ কাব্য* উপলক্ষ মাত্র, প্রকৃতপক্ষে, এ-কাব্য অবলম্বনে বাংলা সমালোচনার বিষয় ও রূপ নির্মাণে নতুন ধারার সূত্রপাত হলো। দু'টো দৃষ্টান্ত থেকে এ-পর্যায়ের রবীন্দ্রমননের বৈভব ও বৈদগ্ধ্য সন্ধান করা যেতে পারে :

১. মনের মধ্যে যখন একটা বেগবান অনুভাবের উদয় হয়, তখন কবিরা তাহা গীতিকাব্যে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। তেমনি মনের মধ্যে যখন একটি মহৎ ব্যক্তির উদয় হয়, সহসা যখন একজন পরম পুরুষ কবিদের কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, মনুষ্য চরিত্রের উদার মহত্ত্ব তাঁহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁহারা উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই পরম পুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষার মন্দির নির্ম্মাণ করিতে থাকেন। সে মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবীর গভীর অন্তর্দ্দেশে নির্বিষ্ট থাকে, সে মন্দিরের চূড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে। সেই মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হন তাঁহার দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, পুণ্যকিরণে অভিভূত হইয়া নানা দিক্‌দেশ হইতে যাত্রীরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসে। ইহাকেই বলে মহাকাব্য। মহাকাব্য পড়িয়া আমরা তাহার রচনাকালের যথার্থ উন্নতি অনুমান করিয়া লইতে পারি।[৯]

২. বাহুবলদৃপ্ত একিলিস্‌ই ইলিয়ডের নায়ক ও যুদ্ধবর্ণ নাই তাহার আদ্যোপান্ত। আর আমরা দেখিতেছি বাল্মীকির সময়ে ধর্ম্মবলই যথার্থ মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য ছিল--কেবল মাত্র দাম্ভিক বাহুবলকে তখন ঘৃণা করিত। হোমরে দেখ একিলিসের ঔদ্ধত্য, একিলিসের বাহুবল, একিলিসের হিংস্র প্রবৃত্তি; আর রামায়ণে দেখ একদিকে রামের সত্যের অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে লক্ষ্মণের প্রেমের অনুরোধে আত্মত্যাগ, এক দিকে বিভীষণের ন্যায়ের অনুরোধে সংসারত্যাগ।...হোমরের সময়ে বলকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিত ও বাল্মীকির সময়ে ধর্ম্মকেই বল বলিয়া জানিত। [১০]

সমালোচক রবীন্দ্রনাথের জীবনজিজ্ঞাসা ও শিল্পবোধ এ-ভাবেই তার ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেছিলো। এবং সে ভিত্তি কেবল রোম্যান্টিক কবির নান্দনিক সৌন্দর্যবোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলোনা, সময়, সমাজ ও ইতিহাসবোধের সাথে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সাহিত্য ও শিল্পঐতিহ্যের অঙ্গীকারে তার মূল নিহিত ছিলো আরো গভীরে।

তিন

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যে গ্রন্থ-আলোচনার সংখ্যা অপ্রতুল নয়। এর কারণ, কেবল পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থ-আলোচনা করেন নি, আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান এবং জাতিসত্তা-অনুসন্ধানের পথপরিক্রমায় তাঁর রূপান্তরপ্রবণ শিল্পী-অস্তিত্বের বিবর্তনের স্বরূপটিও এতে বিধৃত হয়েছে। তবে *বঙ্গদর্শন-ভারতী-সাধনা* পর্বেই রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক গ্রন্থের আলোচনা করেছেন। কখনো নিজের শিল্প-আগ্রহ

থেকে, আবার কখনো–বা সাময়িক পত্রের প্রয়োজনে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর (১৯১৪–১৯১৭) কালে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ–আলোচনার সংখ্যা সীমিত হয়ে আসে। এ–পর্যায়ের আলোচনাসমূহ কখনো কোনো গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে, কখনো–বা চিঠিপত্রের মাধ্যমে আবার কখনো অভিভাষণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। নির্বাচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, সাহিত্যের ইতিহাস, সামাজিক–রাজনৈতিক ইতিহাস, জীবনী, ধর্ম–আলোচনা, ধর্মগ্রন্থ, ভ্রমণ–কাহিনী থেকে শুরু করে দর্শন কিংবা চিত্রকলাবিষয়ক গ্রন্থও রয়েছে। বিষয়ের এই বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের বহুপ্রসারী অবলোকনের ফল।

বাংলা সাহিত্যে রোম্যান্টিক শিল্প–আন্দোলনের প্রতিভূ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। 'চিরাচরিত প্রথার অন্ধ আনুগত্য রবীন্দ্রনাথ কখনোই সহ্য করেন নি। সমালোচনার ক্ষেত্রে সমস্ত গতানুগতিক ফরমুলাকে তিনিও বাতিল ক'রে দিয়েছেন। কিন্তু বিচার জিনিসটাকে তিনি বাতিল ক'রে দেন নি। বাতিল করা দূরে থাকুক বরং বিচার বা মূল্যায়নের উপরেই তার আসল জোর। ব্যাখ্যা বা পরিচয় তো বটেই, কিন্তু সেইখানেই শেষ নয়। মাঝে মাঝে অন্যরকম কথা বললেও, রচনা–বিশেষের সাহিত্যমূল্য নিরূপণই রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যসমালোচকের আসল দায়িত্ব।' [১১] গ্রন্থ–আলোচনাগুলোতে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সাহিত্যরূপের যে মূল্যায়ন উপস্থাপন করেছেন, তার মধ্যে বিচিত্র প্রবণতার সাক্ষ্য মেলে। পরিচয়ধর্মী রচনা থেকে শুরু করে আত্মদর্শনের গভীর এষণা পর্যন্ত কোনো কোনো আলোচনায় পাওয়া যায়। সাহিত্যসমালোচনাবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ প্রসঙ্গত, উপস্থা–পনযোগ্য:

১. --সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়। এই ব্যাখ্যা মুখ্যত সাহিত্য বিষয়ের ব্যক্তিকে নিয়ে, তার জাতিকুল নিয়ে নয়। অবশ্য, সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিচার কিংবা তাত্ত্বিক বিচার হতে পারে। সে রকম বিচারে শাস্ত্রীয় প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যিকে প্রয়োজন নেই। [১২]

২ ....সাহিত্যের স্বাধীন রচনায় এক–একজনের প্রতিভা সর্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে, সর্বকালের আসন অধিকার করে, তেমনি বিচারের প্রতিভাও আছে, এক–একজনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে।...সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয় লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন; স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য। [১৩]

৩. সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি একটা সজীব পদার্থ। কালক্রমে সেটা বাড়ে এবং কমে, কৃশ হয় এবং স্থূল হয়েও থাকে। তার সেই নিত্য–পরিবর্তমান পরিমাণ বৈচিত্র্য দিয়েই সে সাহিত্যকে বিচার করতে বাধ্য, 'আর কোনো উপায় নেই। [১৪]

৪. যাকে সাধারণত আমরা সাহিত্যসমালোচনা বলি, সাহিত্যবিচার শব্দটাকে আমি সেই অর্থে ব্যবহার করেছি। আলোচনা অর্থে বুঝি পরিক্রমা, বিষয়টির উপর পায়চারি করে বেড়ানো; আর বিচারটি হল পরিচয়— তাকে যাচাই করা। বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্য বিচারের লক্ষ্য। [১৫]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসমালোচনার মোটিফ উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে সুস্পষ্ট। সবগুলো গ্রন্থ-আলোচনাকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিচারের পর্যায়ভুক্ত করে দেখেছেন কি না, তা অবশ্যই বিচার্য। পরিচয় আর বিচার যে এক জিনিস নয়, সে সত্য সম্পর্কেও ইঙ্গিত রয়েছে চতুর্থ উদ্ধৃতিতে। তবে সমালোচনা বা বিচার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা তাঁর গ্রন্থ-আলোচনা মূল্যায়নে দিক্‌দর্শনের ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

চার

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-আলোচনাসমূহ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে বিন্যস্ত হয়েছে। বিভিন্ন সংস্করণে কোনো কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তি কিংবা বর্জনও দুর্লক্ষ্য নয়। মূল্যায়নের সুবিধার্থে গ্রন্থ-আলোচনাসমূহের একটি তালিকা এ-ক্ষেত্রে প্রসঙ্গিক। গ্রন্থনাম, প্রথম প্রকাশকাল, প্রকাশস্থান এবং লেখকের নামসহ উপস্থাপন করা হলো:

আধুনিক সাহিত্য

১. *সঞ্জীবচন্দ্র: পালামৌ*, সাধনা, পৌষ ১৩০১
২. *কৃষ্ণচরিত্র*: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাধনা, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০১
৩. *রাজসিংহ*: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাধনা, চৈত্র ১৩০২
৪. *ফুলজানি*: শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সাধনা, অগ্রহায়ণ ১৩০১
৫. *যুগান্তর*: শিবনাথ শাস্ত্রী, সাধনা, চৈত্র ১৩০১
৬. *আর্যগাথা*: দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সাধনা, অগ্রহায়ণ ১৩০১
৭. *আষাঢ়ে*: দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৩০৫
৮. *মন্দ*: দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩০৯
৯. *শুভবিবাহ*: শরৎকুমারী চৌধুরানী, বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩১৩
১০. *মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস*: আবুদল করিম, ভারতী, শ্রাবণ, ১৩০৫
১১. *সাকার ও নিরাকার* (-তত্ত্ব): শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ, ভারতী, আশ্বিন ১৩০৫

প্রাচীন সাহিত্য

১২. *রামায়ণ* [দীনেশচন্দ্র সেনের *রামায়ণী কথা*'র ভূমিকা] জুলাই, ১৯০৪
১৩. *কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা*: কালিদাস, বঙ্গদর্শন, পৌষ ১৩০৮
১৪. *শকুন্তলা*: কালিদাস, বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩০৯
১৫. *কাদম্বরীচিত্র* [কাদম্বরী]: বানভট্ট, প্রদীপ, মাঘ ১৩০৬
১৬. *ধম্মপদং* [চারুচন্দ্র বসু-কর্তৃক সম্পাদিত প্রণীত ও প্রকাশিত], বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১৩১২

সাহিত্য

১৭. *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য*: দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩০৯
১৮. *কবিজীবনী* [টেনিসনের চিঠিপত্র ও জীবনী], বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮

সাহিত্যের পথে

১৯. রূপশিল্প: অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৬

ভারতবর্ষ

২০. *চীনেম্যানের চিঠি* [জন চীনাম্যানের পত্র: লোয়েস ডিকিন্সন], বঙ্গদর্শন ১৩০৯

কালান্তর:

২১. *রায়তের কথা*: প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্র, আষাঢ় ১৩৩৩

উপরি-উক্ত গ্রন্থসমুহ ছাড়াও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচিত *সিরাজদ্দৌলা*।[১৬] এবং *কঙ্কাবতী* নামক একটি উপন্যাসের সমালোচনারও (সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৯) উল্লেখ[১৭] সমালোচকরা করেছেন।

পাঁচ

আধুনিক সাহিত্য (১৩১৪) গ্রন্থ-অন্তর্ভূত আলোচনাসমূহে নির্বাচন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যপ্রিয় ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বিধৃত। কবিস্বভাবের রুচি ও আদর্শের পরিচয় যেমন এ-সকল আলোচনায় রয়ছে, তেমনি কঠোর বিচারনিষ্ঠা ও নিরাবেগ মননশীলতার প্রয়োগও অনিবার্য রূপ পেয়েছে। কবির অন্তর্দৃষ্টি ও সমালোচকের বস্তুনিষ্ঠ কৌতূহলের সাথে যুক্ত হয়েছে শিল্প-অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের বিচিত্রমুখী মাত্রা। 'সমসাময়িক উচ্চতর সাহিত্যের রসাস্বাদনের আনন্দে পূর্ণ'[১৮] *আধুনিক সাহিত্য* গ্রন্থের আলোচনাগুলো বাংলা সাহিত্যসমালোচনার আদর্শ রূপে বিবেচিত হবার যোগ্য।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পালামৌ* একটি ভ্রমণকাহিনী। গ্রন্থটির মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথ কেবল গ্রন্থবিষয়ের গভীরেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন নি, সমগ্র সঞ্জীবচন্দ্রকেই পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে *পালামৌ* বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনী। এ-ক্ষেত্রে উচ্ছ্বাস ও আবেগী প্রশংসার যথেষ্ট অবকাশ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যবিচারের আদর্শকেই সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছেন। 'প্রতিভার ঐশ্বর্য' ও 'গৃহিণীপনা'র দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে সঞ্জীবচন্দ্রের শিল্পী-অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনার স্বরূপ নির্দেশ করেছেন। নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে লেখকের স্বরূপ অবলোকনের পাশাপাশি তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যও এতে নির্দেশিত হয়েছে:

> পালামৌ ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের যে একটি অকৃত্রিম সজীব অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এমন সচরাচর বাংলা লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না। সাধারণত আমাদের জাতির মধ্যে একটি বিজ্ঞ বার্ধ্যক্যের লক্ষণ আছে; আমাদের চক্ষে সমস্ত জগৎ

যেন জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সৌন্দর্যের মায়া-আবরণ যেন বিস্রস্ত হইয়াছে, এবং বিশ্ব সংসারের অনাদি প্রাচীনতা পৃথিবীর মধ্যেমে কেবল আমাদের নিকটই ধরা পড়িয়াছে। সেই জন্য অশনবসন ছন্দভাষা আচারব্যবহার বাসস্থান সর্বত্রই সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের এমন সুগভীর অবহেলা। কিন্তু সঞ্জীবের অন্তরে সেই জরার রাজত্ব ছিল না। তিনি যেন একটি নূতন সৃষ্ট জগতের মধ্যে এক জোড়া নূতন চক্ষু লইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। [১৯]

রবীন্দ্রনাথের এ-পর্যায়ের সৌন্দর্যবোধ, জীবন-অবলোকনের বৈশিষ্ট্য, বিষয়ের সাথে সাথে আঙ্গিকবিচারের অনিবার্যতাবোধ সঞ্জীবচন্দ্র-আলোচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। কোনো সাহিত্য-কর্মবিচারে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও সমগ্রতাস্পর্শী মূল্যায়ন যে সমালোচক রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট, এ-আলোচনাটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আলোচনার সমাপ্তি পর্যায়ে সঞ্জীবচন্দ্র-প্রতিভার মৌল স্বরূপটিই যেন উন্মোচিত হয়েছে:

সঞ্জীব বালকের ন্যায় সকল জিনিস সজীব কৌতূহলের সহিত দেখিতেন এবং প্রধান চিত্রকরের ন্যায় তাহার প্রধান অংশগুলি নির্বাচন করিয়া লইয়া তাঁহার চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন এবং ভাবুকের ন্যায় সকলের মধ্যেই তাঁহার নিজের একটি হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন। [২০]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *কৃষ্ণচরিত্র* ও *রাজসিংহ* গ্রন্থের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সমালোচকসত্তার সমগ্র রূপের উন্মোচন ঘটেছে। একদিকে তত্ত্ব, তথ্য ও বিশ্লেষণময় *কৃষ্ণচরিত্র*, অন্যদিকে *রাজসিংহ* উপন্যাসে বিষয় ও শিল্পের নিগূঢ় সংশ্লেষ—এই উভয়বিধ সাহিত্যরূপ বিচারে রবীন্দ্রপ্রতিভার ভারসাম্যবোধ বিস্ময়কর। *কৃষ্ণচরিত্র* গ্রন্থের আলোচনাসূত্রে তিনি উনিশ শতকীয় বাংলার সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতিচেতনার সামগ্রিক চিত্রকেই যেন উন্মোচন করেছেন। বঙ্কিমমানসের নতুন প্রান্ত নির্ণয়ের অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বজ্ঞান, মানবভাবনা, পুরাণ ও ইতিহাসবোধের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বঙ্কিমমানসে রেনেসাঁস-উত্তর মানববোধ এবং বেদ-উপনিষদ প্রভাবিত প্রাচীন-ভারতীয় আর্য মূল্যবোধের অঙ্গীকারজনিত যে দ্বন্দ্ব, রবীন্দ্রনাথ তা সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। *মহাভারত*-এর ইতিহাসধর্মিতা কিংবা কাব্যধর্মিতা নির্ণয়ের প্রশ্নে বঙ্কিমমানস-সংকট সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করেছেন এবং নিজের সাহিত্যাদর্শ, ধর্মবোধ, তত্ত্বজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাসবোধের নৈয়ায়িক শৃঙ্খলায় বিচার করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এ-ক্ষেত্রে উদ্ধৃতিযোগ্য:

১. কৃষ্ণচরিত্রের রীতিমত ইতিহাস-সমালোচনা এই প্রথম। ইতিপূর্বে কেহ ইহার সূত্রপাত করিয়া যায় নাই, এই জন্য ভাঙিবার এবং গড়িবার তার উভয়ই বঙ্কিমকে লইতে হইয়াছে। কোন্‌টা ইতিহাস তাহা স্থির করিবার পূর্বে কোন্‌টা ইতিহাস নহে তাহা নির্ণয় করা বিপুল পরিশ্রমের ও বিচক্ষণতার কাজ। আমাদের বিবেচনায় বর্তমান বঙ্কিম সেই ভাঙিবার কাজ অনেকটা পরিমাণে শেষ করিয়াছেন, গড়িবার কাজে ভালো করিয়া হস্তক্ষেপ করিবার অবসর পান নাই।[২১]

২. বঙ্কিম, মেকলে কার্লাইল লামার্টিন্ থুকিদিদীস্ প্রভৃতি উদাহরণ দেখাইয়া মহাভারতকে কবিত্বময় ইতিহাস বলিতে চাহেন; আমরা মহাভারতকে ঐতিহাসিক কাব্য বলিয়া গ্রহণ করি।[২২]

৩. তথ্য, যাহাকে ইংরাজিতে fact কহে, সত্য তদপেক্ষা অনেক ব্যাপক। এই তথ্যস্তূপ হইতে যুক্তি এবং কল্পনা বলে সত্যকে উদ্ধার করিয়া লইতে হয়। অনেক সময় ইতিহাসের শুষ্ক ইন্ধনের ন্যায় রাশীকৃত তথ্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সত্য কবির প্রতিভা বলে কাব্যেই উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ২৩

বঙ্কিমচন্দ্র ভক্তির আচ্ছন্নতা থেকে কৃষ্ণচরিত্রকে মুক্ত করেছেন বটে, কিন্তু তা হয়ে পড়েছে একান্তভাবেই তত্ত্ব ও তথ্যনির্ভর। সত্যসন্ধানী রবীন্দ্রনাথের কাছে এই তথ্যপ্রিয়তা বাঞ্ছিত মনে হয় নি। ধর্মের তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের কাছে মূল্য পায়নি, 'মানব সংস্কৃতির মহিমা' ও 'মানবাত্মার অমিত শক্তি'র দীপ্যমানতাই তাঁর চিত্তকে আকৃষ্ট করেছে। 'এই শক্তি মানব সমাজের মধ্যে সর্বজনীন চেতনাকে জয়ী করবারই শক্তি।'২৪ উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিগুলোতে রবীন্দ্রনাথের সমালোচক সত্তার এ-বৈশিষ্ট্যই উন্মোচিত হয়েছে।

রাজসিংহ রবীন্দ্রনাথের, এমনকি, বাংলা সাহিত্যসমালোচনার পটভূমিতেও এক অনতিক্রমণীয় সৃষ্টি। বিষয় ও আঙ্গিকভাবনার এমন নিগূঢ় সংশ্লেষ সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বিরল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ ও শিল্পদৃষ্টি এ-আলোচনায় সর্ববিস্তারী হয়ে উঠেছে। বঙ্কিম-উপন্যাস-অনুধাবনের সঠিক মাত্রাটিকেই যেন তিনি নির্ণয় করেছেন। 'পরিচয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তত্ত্বালোচনা'র সমন্বয়ে সমালোচক রবীন্দ্রনাথ *রাজসিংহ* উপন্যাস আলোচনায় বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ এখানে নতুন শিল্প- অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কারের আনন্দে বিহ্বল। তবে তাঁর সমালোচক-সত্তার সামঞ্জস্যচেতনা ও ভারসাম্যবোধ বিপন্ন হয়নি। বিষয়ের বেগবান আলোচনার অনুষঙ্গে ভাষারীতিও হয়ে উঠেছে গতি-তরঙ্গিত ও ব্যঞ্জ-নাময়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে বক্তব্য সুস্পষ্ট হতে বাধ্য:

১. রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নায়ক কে কে? ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরঙ্গজেব রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ; উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কিনা জানিনা, নায়িকা জেবউন্নিসা।

রাজসিংহ চঞ্চলকুমারী মানিকলাল প্রভৃতি ছোটো-বড়ো অনেকে মিলিয়া সেই মেঘদুর্দিন রথযাত্রার দিনে ভারত-ইতিহাসের রথরজ্জু আকর্ষণ করিয়া দুর্গম বন্ধুর পথে চলিয়াছিল।....

জেবউন্নিসার সহিত ইতিহাসের যোগ আছে বটে, কিন্তু সে যোগ গৌণভাবে। সে যোগটুকু না থাকিলে এ গ্রন্থের মধ্যে তাহার কোনো অধিকার থাকিত না। যোগ আছে, কিন্তু বিপুল ইতিহাস তাহাকে গ্রাস করিয়া আপনার অংশীভূত করিয়া লয় নাই; সে আপনার জীবনকাহিনী লইয়া স্বতন্ত্রভাবে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।২৫

২. ইতিহাসের মহাকোলাহলের মধ্যে এই নবজাগ্রত হতভাগিনী নারীর বিদীর্ণপ্রায় হৃদয় মাঝে মাঝে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রাজসিংহের পরিণাম অংশের বড়ো একটা রোমাঞ্চকর সুবিশাল করুণা ও ব্যাকুলতা বিস্তার করিয়া দিয়াছে।২৬

৩. এই ইতিহাস এবং উপন্যাসকে একসঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনাবহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয় বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব করিতে হইয়াছে, কেহ কাহারও অগ্রবর্তী না হয়, এ-বিষয়ে গ্রন্থকারের লক্ষ্য ছিল দেখা যায়। ২৭

উপন্যাসের শ্রেণীগত পরিচয়, রসবিচার, ঔপন্যাসিকের মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিচারদক্ষতা উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিসমূহে উৎসারিত হয়েছে। 'এর ব্যাখ্যা-অংশের মধ্যে রূপ ও সত্যের···ফর্ম ও কন্টেন্টের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর যে আলোকপাতের প্রয়াস দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা সাহিত্যে তা দুর্লভ বস্তু। এই সূত্রে, শিল্পরূপের উপর আঙ্গিকের প্রভাব; ···শিল্পরূপের প্রয়োজনে আঙ্গিকের নির্বাচন--এই রহস্যের উপরেও হয়তো কিছুটা আলো এসে পড়েছে।'[২৮]

আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থে *রাজসিংহ* ছাড়া আরো তিনটি উপন্যাস-আলোচনা স্থান পেয়েছে। উপন্যাসগুলো যথাক্রমে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের *ফুলজানি*, শিবনাথ শাস্ত্রীর *যুগান্তর* এবং শরৎকুমারী চৌধুরানীরচিত *শুভবিবাহ*। পরিচয়প্রধান এই আলোচনা-সমূহেও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসভাবনা তথা তাঁর সমালোচকসত্তার মৌল স্বভাবের উপস্থিতি দুর্লক্ষ্য নয়। বিকাশপর্যায়ের উক্ত উপন্যাস তিনটির বিচারে তিনি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেছেন। উপন্যাসের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে গোড়া থেকেই যে রবীন্দ্রনাথ সজাগ ও সতর্ক ছিলেন, আলোচনাসমূহ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'রবীন্দ্র-উপন্যাস চিন্তা এ সত্য অনুমোদন করে যে, কোন উপন্যাসের প্রাথমিক ঘটনা, অন্তর্বর্তী ঘটনাস্রোত ও পরিণামী ঘটনার পারম্পর্য ও কার্যকারণ-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ঔপন্যাসিকের আবশ্যিক শর্ত। ঔপন্যাসিকের শিল্পবোধের অন্তর্দ্বন্দ্ব উপন্যাসনির্মিতির বড় অন্তরায়; উপন্যাসশিল্প এ প্রশ্নে ঔপন্যাসিকের সজাগতা দাবী করে। প্রতিভার অহেতুক আত্মবিরোধ কিভাবে উপন্যাসের চরিত্র-ঐক্য, ঘটনা-ঐক্য ও গঠন-ঐক্য বিঘ্নিত করে, রবীন্দ্রনাথ *ফুলজানি* উপন্যাস সমালোচনা প্রসঙ্গে তা বিশ্লেষণ করেছেন'।[২৯] এ-উপন্যাস বিচারেও রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিকের সমগ্র রূপ অন্বেষণ করেছেন এবং সীমাবদ্ধতা বা সম্ভাবনার প্রতিও রেখেছেন সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি:

> পরিচিত সহজ সৌন্দর্যের সহিত সুন্দরভাবে সহজে পরিচয়সাধন করাইয়া দেওয়া অসামান্য ক্ষমতার কাজ; বাংলার লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশবাবুর সেই অসামান্য ক্ষমতাটি আছে, কিন্তু তিনি তদপেক্ষা আরো অধিক ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া পাঠককে চমৎকৃত করিতে চাহেন এবং সেই কাজ করিতে গিয়া প্রতিভার মধ্যে অনর্থক একটা আত্মবিরোধ বাধাইয়া বসেন। প্রতিভাবহির্গামী এই দুরাশায় তাহার প্রথম রচিত উপন্যাস 'শক্তিকানন'-এর মাঝখানে দাবানল জ্বালাইয়া ছারখার করিয়া দিয়াছে, এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ফুলজানি'রও একটি প্রান্তভাগে তাহার একটি শিখা আপন প্রলয়রসনা বিস্তার করিয়াছে—সৌভাগ্যক্রমে সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে নাই। ৩০

আবহমান বাংলার জীবন ও প্রকৃতির সজীবতা, সরল মানব-হৃদয়ের গভীরতা, 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের চিরানন্দময় ইতিহাস' এবং 'আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজনবৎসল; বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড কর্মশীল-পৃথিবীর-এক-নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙালির কাহিনী' হিসেবেই *ফুলজানি* উপ-ন্যাস রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিলো। মানবজীবনের অবিশ্রান্ত স্রোতের প্রবহ-

মানতা রবীন্দ্রনাথ এতে প্রত্যক্ষ করেছেন।[৩১] লক্ষণীয় যে, *মানসী–সোনারতরী–চিত্রা* পর্যায়ের রোম্যান্টিক রবীন্দ্রজীবনদৃষ্টির অনুরণন উপন্যাস আলোচনাসমূহেও উপস্থিত। চরিত্র–চিত্রণ যে উপন্যাসের এক অপরিহার্য শর্ত *যুগান্তর* উপন্যাস আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ–সংক্রান্ত উচ্চারণ লক্ষণীয়ঃ

এমন পর্যবেক্ষণ, এমন চরিত্রসৃজন, এমন সরস হাস্য, এমন সরল সহৃদয় বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ।…এমন সত্য চরিত্র বাংলা উপন্যাসে ইতিপূর্বে কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। লেখক তাঁহাকে সমস্ত তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে প্রত্যক্ষবৎ জাজ্বল্যমান দেখিয়াছেন— তাঁহার চরিত্রটিকে প্রতিদিনের হাস্যে এবং অশ্রুজলে, দোষে এবং গুণে অতি সহজেই সজীব করিয়া তুলিয়াছেন। ৩২

ঔপন্যাসিককে যেমন নীতিপ্রচারক হলে চলে না, নীতিবান চরিত্রও তেমনি উপন্যাসের মানবীয়তার পক্ষে ক্ষতিকর। *যুগান্তর*–এ ঔপন্যাসিকের এই ত্রুটি প্রত্যক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন, 'গ্রন্থকার পূর্বে যেখানে মানুষ গড়িতেছিলেন এখন সেখানে মত গড়িতে লাগিলেন', অথবা, 'বিচিত্র মতামত এবং তর্কবির্তক গুলা একেবারে গোটা আসিয়া পড়ে, তাহা রক্তমাংসের মানবাকারে পরিণত হইয়া উঠেনা।'[৩৩] সুতরাং উপন্যাসের বিষয় ও আঙ্গিক সম্পর্কে রবীন্দ্রদৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় উক্ত উপন্যাস–আলোচনায় স্পষ্ট। 'টেকনিকগত কিংবা গঠনগত আলোচনা রবীন্দ্র–নাথের সমালোচনা– সাহিত্যে খুব বেশি নেই। উক্ত প্রবন্ধদুটিতে, আলোচিত উপন্যাসদুটির গঠনগত ত্রুটি সম্পর্কে, তাদের উভয়েরই এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের সামঞ্জস্যের অভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে– যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন তার মধ্যে মূল্যের নির্দেশ অনতিপ্রচ্ছন্ন।'[৩৪]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের *আর্যগাথা, আষাঢ়ে* ও *মন্দ*—এই তিনটি সঙ্গীত ও কবিতাগ্রন্থের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও কাব্যভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। পরিচয়প্রধান হলেও স্বল্পপরিসরে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ আলোচনা তিনটিকে করে তুলেছে হৃদয়গ্রাহী। 'সংগীতপুস্তক' *আর্যগাথার* সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের গভীর সঙ্গীতবোধের পরিচয় সুস্পষ্ট। যেমন,

…কতকগুলি গান আছে যাহা কাব্য হিসাবে অনেকটা সম্পূর্ণ, যাহা পাঠক মাত্রেই হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক ও সৌন্দর্যের সঞ্চার করে। যদিচ সে–গানগুলির মাধুর্যও সম্ভবত সুরসংযোগে অধিকতর পরিস্ফুটতা, গভীরতা এবং নূতনত্ব লাভ করিতে পারে, তথাপি ভালো এনগ্রেভিং হইতে তাহার আর্দশ অয়েল পেন্টিঙের সৌন্দর্য যেমন অনেকটা অনুমান করিয়া লওয়া যায় তেমনি কেবলমাত্র সেই সকল কবিতা হইতে গানের সমগ্র মাধুর্য আমরা মনে মনে পূরণ করিয়া লইতে পারি।[৩৫]

হাস্যরসপ্রধান কবিতাগ্রন্থ *আষাঢ়ে* সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের কাব্যবোধের স্বতন্ত্র প্রান্ত উন্মোচিত। *মন্দ* গ্রন্থটিকে রবীন্দ্রনাথ ঐসময়ের বাংলা কাব্যজগতের এক স্মরণীয় কীর্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কবিতার বিষয় ও শিল্পরূপ বিবেচনায়

রবীন্দ্রনাথের অণুসূক্ষ্ম অনুভবের পরিচয় এ-আলোচনায় বিধৃত। 'মন্দ্র কাব্যের প্রায় প্রত্যেকটি কবিতা নব নব গতিভঙ্গে যেন নৃত্য করিতেছে, কেহ স্থির হইয়া নাই; ভাবের অভাবনীয় আবর্তনে তাহার ছন্দ ঝংকৃত হইয়া উঠিতেছে এবং তাহার অলংকারগুলি হইতে আলোক ঠিকরিয়া পড়িতেছে।' অথবা 'নর্তনশীলা নটীর সঙ্গে তুলনা করিলে মন্দ্রকাব্যের কবিতাগুলির ঠিক বর্ণনা হয় না। কারণ, ইহার কবিতাগুলির মধ্যে পৌরুষ আছে। ইহার হাস্য বিষাদ বিদ্রূপ বিস্ময় সমস্তই পুরুষের, তাহাতে চেষ্টাহীন সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সবলতা আছে।'[৩৬] অর্থাৎ কবি রবীন্দ্রনাথ এখানে সমালোচক রবীন্দ্রনাথে রূপান্তরিত হয়েছেন। কবিদৃষ্টি তাঁর সমালোচকসত্তাকে আচ্ছন্ন করেনি; বরং তাঁর স্বীয় কবিসত্তা সমালোচকসত্তায় পূর্ণতা দান করেছে।

রবীন্দ্রনাথের ইতিহসচেতনার অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত *মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস* আলোচনাটি। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসজ্ঞান সময় সমাজ ও সভ্যতাবোধের সমন্বয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। ভারতবর্ষে মুসলমানদের অনুপ্রবেশের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ক্রম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মহাকালের মতো নিরাসক্তি ও কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। প্রকৃত পক্ষে, আবদুল করিম প্রণীত গ্রন্থ-আলোচনার অনুষঙ্গে তিনি ভারতবর্ষের সত্য-ইতিহাস আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেছেন। 'মুসলমান প্রবেশের অনতিপূর্বে' ভারত ইতিহাসে যে 'রোমাঞ্চকর মহাশূন্যতা', সমস্ত দেশব্যাপী যে 'চেতনাহীন সুষুপ্তির অন্ধকার' বিরাজিত ছিলো--তার অন্তর-বাহির অন্বেষণে রবীন্দ্রনাথের অনুসন্ধান ও বিচারক্ষমতা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি মুসলমান আগমনের কার্যকারণও বস্তুনিষ্ঠ অনুভব ও অনুভাবে উজ্জ্বল। মুসলমান অনুপ্রবেশের সময়কালীন ভারতবর্ষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের স্বরূপ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কিরূপ ছিলো, তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত:

> তখন শান্ত পুরাতন ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্ম বৌদ্ধদের দ্বারা পরাস্ত, এবং বৌদ্ধধর্ম বিচিত্র বিকৃত রূপান্তরে ক্রমশ পুরাণ-উপপুরাণের শতধাবিভক্ত ক্ষুদ্র সংকীর্ণ বক্রপ্রণালীর মধ্যে স্রোতোহীন মন্দগতিতে প্রবাহিত হইয়া একটি সহস্রলাঙ্গুল শীতরক্ত সরীসৃপের ন্যায় ভারতবর্ষকে শত পাকে জড়িত করিতেছিল। তখন ধর্মে সমাজে শাস্ত্রে কোনো বিষয়ে নবীনতা ছিল না, গতি ছিল না, বৃদ্ধি ছিল না; সকল বিষয়েই যেন পরীক্ষা শেষ হইয়া গেছে, নূতন আশা করিবার বিষয় নাই। সে সময়ে নূতনসৃষ্ট মুসলমানজাতির বিশ্ববিজয়োদ্দীপ্ত নবীন বল সংবরণ করিবার উপযোগী কোনো একটা উদ্দীপনা ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল না।[৩৭]

এই সুগভীর ইতিহাসজ্ঞান রবীন্দচেতনাকে নতুন মাত্রায় অভিষিক্ত করেছে।

দর্শন রবীন্দ্রসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সূত্রেই আমরা রবীন্দ্রদর্শন শব্দবন্ধটি প্রয়োগ করি। রবীন্দ্রজীবনে ও শিল্পে এক রূপান্তরপ্রবণ ও গতিশীল দর্শনকে আমরা

প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু দর্শনশাস্ত্র আলোচনায় রবীন্দ্রমনন নিজ দর্শন দ্বারা অন্য দর্শনকে আচ্ছন্ন করে নি, বরং বিশ্বদর্শনের বিচিত্র উৎসে পরিভ্রমণ করেছে। *সাকার ও নিরাকার* প্রবন্ধটি যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত *সাকার ও নিরাকার*-তত্ত্ব গ্রন্থের মূল্যায়ন। যতীন্দ্রমোহন তাঁর গ্রন্থে ঈশ্বর যে আকারময় (সাকার)এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়েছেন। নিজ-অবলম্বিত ধর্মদর্শনের দর্পণে সাকার উপাসনাহীন ধর্মের অসারত্ব যুক্তি-তর্কের সাহায্যে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বস্তুনিষ্ঠ সত্যের আলোকে যতীন্দ্রমোহনের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা উন্মোচন করেছেন। এ-ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মাদর্শ, এমনকি বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তও রবীন্দ্রনাথ আহরণ করেছেন। যেমন,

১. মুসলমানেরা মূর্তিপূজা করে না। অথচ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্ত কেহ নাই বা কখনো জন্মেন নাই, এ কথা বিশ্বাস্য নহে। কী করিয়া যে তাঁহাদের ভক্তিবৃত্তির পরিতৃপ্তি হয় তাহা যতীন্দ্রমোহনবাবু না বুঝিতে পারেন, কিন্তু মূর্তিপূজা করিয়া নহে একথা নিশ্চয়।[৩৮]

২. টলেমির জগৎতন্ত্র আমাদের ধারণাযোগ্য। পৃথিবীকে মধ্যে রাখিয়া বদ্ধ কঠিন আকাশে জ্যোতিষ্কগণ সংকীর্ণ নিয়মে ঘুরিতেছে, ইহা ঠিক মনুষ্যমনের আয়ত্তগম্য। কিন্তু অধুনা জ্যোর্তিবিদ্যার বন্ধনমুক্তি হইয়াছে, সে সীমাবদ্ধ ধারণার বাহিরে অনন্ত রহস্যের মধ্যে পড়িয়াছে বলিয়া তাহার গৌরব বাড়িয়াছে। [৩৯]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিদ্বয়ে রবীন্দ্রনাথের এ-পর্যায়ের (১৮৯৮) ধর্মদর্শনের স্বরূপও অস্পষ্ট নয়। নিজ বিশ্বাসবহির্ভূত বলেই যে তিনি যতীন্দ্রমোহনের মত খণ্ডন করেছেন, তা বলা যাবে না; বরং তথ্য, তত্ত্ব ও যুক্তির আলোকে উপলব্ধ সত্য প্রমাণ করেছেন। এবং তার ধর্মচিন্তাও যে গভীর বিজ্ঞানবোধ পরিস্রুত ছিলো, উল্লিখিত আলোচনা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ছয়

রবীন্দ্রনাথের শিল্পীমানসে রোম্যান্টিক জীবনদৃষ্টির সাথে ক্লাসিক আদর্শের অন্তর্ময় সমন্বয় ঘটেছিলো। নবজাগ্রত কালের অনিবার্য প্রয়োজনে রোম্যান্টিক আদর্শের অনুপ্রবেশ তাঁর প্রচেষ্টায় অর্জন করেছিলো নির্বাধ গতি ও তারুণ্য। ইতঃপূর্বে, উনিশ শতকীয় শিল্পীমনে রোম্যান্টিক অনুভূতির উপস্থিতি দুর্লক্ষ্য নয়। মধুসূদনের কাব্যে যে গীতময় অন্তর্বেদনা ও পরাভবচেতনার বিন্যাস ঘটেছে, তার মূলেও রয়েছে রোম্যান্টিক জীবনবোধের কালসঙ্গত অঙ্গীকার। কিন্তু ক্লাসিক রূপবন্ধ সেই রোম্যান্টিক গীততরঙ্গকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলো। বিহারীলালের নিভৃতচারী রোম্যান্টিক কাব্যসাধনাও এ-কারণে কালের রুচিকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করতে সক্ষম হয় নি। রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন সেই প্রমেথিউসরূপী রোম্যান্টিসিজমকে বন্ধনমুক্ত করলেন, তেমনি, অন্যদিকে চিরায়ত (*Classic*) সাহিত্য-শিল্পের

উত্তরাধিকার থেকেও বিচ্যুত হলেন না। ফলে, তাঁর মধ্যে উভয় আদর্শের আন্তরক্রিয়ায় জন্ম নিলো নবতর বিষয় ও আঙ্গিকচেতনা। *প্রাচীন সাহিত্য* (১৩১৪) গ্রন্থের প্রবন্ধসমূহ রবীন্দ্রমানসের উল্লিখিত প্রান্তকেই উন্মোচন করেছে। ভারতীয় সাহিত্যের ক্লাসিক যুগের বিভিন্ন গ্রন্থ ও চরিত্রের বিশ্লেষণে 'রবীন্দ্রনাথ যেন নিজের ধর্ম এবং বিশ্বাসকেই ব্যা াা করলেন। তাই এর সঙ্গে কবির জীবনবোধও ধ্বনিত।'[৪০] এ-কারণেই *প্রাচীন সাহিত্য* গ্রন্থে বিধৃত আলোচনাগুলো রবীন্দ্রনাথের সমালোচক-সত্তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে।

রামায়ণ শীর্ষক আলোচনাটি দীনেশচন্দ্র সেনের *রামায়ণী কথা* গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে রচিত। এ-আলোচনাকে পরিচয় বা বিচার— কোন পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। গ্রন্থ-অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেন নিজ উপলব্ধ জীবনবোধ ও সাহিত্যাদর্শকেই প্রকাশ করেছেন। মহাকব্যের সংজ্ঞা দান প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাকে 'মানবের চিরন্তন সামগ্রী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। 'বিশ্বমানবের চিরন্তন হৃদয়াবেগ ও জীবনের মর্মকথা'—পরিস্রুত মহাকাব্য, তাঁর বিবেচনায়, বৃহৎ বনস্পতির মতো—যা দেশের ভূতল জঠর থেকে উদ্ভূত হয়ে সে দেশকেই দান করে আশ্রয়চ্ছায়া। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথ, একটি গ্রন্থের অনুষঙ্গে নিজ জীবনদৃষ্টি ও শিল্পবোধের অন্তঃস্থ সত্যকে উন্মোচন করেছেন—কাব্যবোধ তথা ইতিহাস-ভাবনার স্বরূপও নির্দেশিত হয়েছে:

> এমন অবস্থায় রামায়ণ-মহাভারতকে কেবল মাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে; কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া থাকে, রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস; অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্তু এ ইতিহাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যধর্মের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান। [৪১]

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিও সুস্পষ্ট। তিনি মনে করেন, এই রূপ পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই প্রকৃত সমালোচনা, এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর-এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়।

কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, *শকুন্তলা* এবং *কাদম্বরীচিত্র*— আলোচনা তিনটিতে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ, সাহিত্যাদর্শ ও জীবনভাবনার নতুন প্রান্ত উন্মোচিত হয়েছে। বিচার বা ব্যাখ্যাদান অপেক্ষা শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ প্রকাশের ওপরই এ-ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য জীবনের অনুকরণ— অ্যারিস্টটল কথিত তত্ত্ব যেন এখানে নতুন মাত্রা পেয়েছে। 'জীবনের 'অনুকরণ' নয়, জীবনের (অথবা বলা যায়, জীবন উপলব্ধির) রূপায়ণ। সত্যের বাহ্যমূর্তি রূপায়ণের দাবিকে স্বীকার করে নেয়। অন্যদিকে, রূপায়ণও তেমনি সত্যের আভ্যন্তরিক মূর্তিকে স্বীকার করে, এবং তাকে উজ্জ্বল ক'রে তোলার মধ্যে দিয়েই সার্থক হয়ে ওঠে।'[৪২] অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে 'সত্যের দাবি ও রূপের দাবি', বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত।

কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, কিংবা *শকুন্তলা* প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত সত্য অনুসারেই প্রত্যক্ষ করেছেন সাহিত্যকে। অর্থাৎ সাহিত্য-শিল্প যেন মানুষের জীবন ও জগৎ উপলব্ধিরই জীবন্ত বিগ্রহ। দুটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপনযোগ্যঃ

১. কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলায় কাব্যের বিষয় একই। উভয় কাব্যেই কবি দেখাইয়াছেন,— মোহে যাহা অকৃতার্থ মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত, দেখাইয়াছেন, ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধ্রুব এবং প্রেমের শান্ত সংযত কল্যাণরূপই শ্রেষ্ঠরূপ—বন্ধনে যথার্থ শ্রী এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় সৌন্দর্যের আশু বিকৃতি। ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই। মঙ্গলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।[৪৩]

২. বিশ্বপ্রকৃতি যেমন বাহিরে প্রশান্ত সুন্দর কিন্তু তাহার প্রচণ্ড শক্তি অহরহ অভ্যন্তরে কাজ করে, অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকখানির মধ্যে আমরা তাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাই। এমন আশ্চর্য সংযম আমরা আর-কোনো নাটকেই দেখি নাই।[৪৪]

শকুন্তলা-য় রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় সাহিত্যের, বিশেষ করে শেকস্‌পীয়রের নাটকের সাথে তুলনামূলক মূল্যায়নে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের আদর্শরূপ নির্ণয় করেছেন। তাঁর মতে, 'টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি। টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি। টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ্, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান।' টেম্পেস্টের সরল মাধুর্যের প্রতিষ্ঠা যেখানে অজ্ঞতা অনভিজ্ঞতায় অপূর্ণ, সেখানে 'শকুন্তলায় সরলতা অপরাধে দুঃখে অভিজ্ঞতায় ধৈর্যে ও ক্ষমায় পরিপক্ক, গম্ভীর ও স্থায়ী।' 'ভারতবর্ষীয় জীবনপ্রকৃতি এবং শেক্সপীয়রীর জীবনপ্রকৃতির তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন ভারতীয় সাহিত্যের রূপরীতি শেক্সপীয়রীয় সাহিত্য থেকে ভিন্ন হবেই।'[৪৫] ইউরোপীয় সাহিত্যে যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব আধিপত্যের প্রসঙ্গ, ভারতীয় সাহিত্যে সেখানে 'প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা হৃদয়ের সম্পর্ক, সুগভীর সহমর্মিতা', 'বিরোধের দ্বারা নিজেকে স্বতন্ত্র করে তোলা নয়, মিলনের দ্বারা নিজেকে সম্পূর্ণ করে দেখা--এটাই ভারতীয় সাহিত্যের মর্ম।'[৪৬]

কাদম্বরীচিত্র অনেকটা পরিচয় ও বিচারধর্মী আলোচনা। তবুও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের স্রষ্টা চৈতন্যে যে গভীর কম্পন-তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিলো, এ-আলোচনায়ও তার প্রকাশ সুস্পষ্ট। জীবন-সংক্রান্ত তথ্যজ্ঞান অপেক্ষা জীবনের উপলব্ধি ও তার রূপায়ণই যে বড়ো কথা—এ-সত্যই *কাদম্বরীচিত্র* আলোচনায় অভিব্যক্ত হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষণের রূপ বিষয়ের প্রয়োজনেই স্বতন্ত্র বাণীমূর্তি লাভ করেছেঃ

সংস্কৃত কবিদের মধ্যে চিত্রাঙ্কনে বাণভট্টের সমতুল্য কেহ নাই, এ-কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। সমস্ত কাদম্বরীকাব্য একটি চিত্রশালা। সাধারণত লোকে ঘটনা বর্ণনা করিয়া গল্প করে--বাণভট্ট পরে পরে চিত্র সজ্জিত করিয়া গল্প বলিয়াছেন--এজন্য তাঁহার গল্প গতিশীল নহে, তাহা বর্ণচ্ছটায় অঙ্কিত।[৪৭]

ধম্মপদং আলোচনায় পরিচয়ের বস্তুদৃষ্টি এবং বিচারের সূক্ষ্মদৃষ্টির সাথে যুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যজ্ঞান। উক্ত গ্রন্থটি চারুচন্দ্র বসু প্রণীত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'ধম্মপদ–নামক পালিগ্রন্থের মূল অন্বয় সংস্কৃতব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ'। গ্রন্থ–আলোচনাসূত্রে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের যথার্থ ইতিহাসের রূপ ও স্বরূপ নির্ণয় করেছেন:

ভারতবর্ষের মন যদি রাষ্ট্রগঠনে লিপ্ত থাকিত তাহা হইলে ইতিহাসের বেশ মোটা মোটা উপকরণ পাওয়া যাইত এবং ঐতিহাসিকের কাজ অনেকটা সহজ হইত। কিন্তু তাই বলিয়া ভারতবর্ষের মন যে নিজের অতীত ও ভবিষ্যৎকে কোনো ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে নাই তাহা স্বীকার করিতে পারিনা। সে সূত্র সূক্ষ্ম, কিন্তু তাহার প্রভাব সামান্য নহে; তাহা স্থূলভাবে গোচর নহে, কিন্তু তাহা আজ পর্যন্ত আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় নাই। সর্বত্র যে বৈচিত্র্যহীন সাম্য স্থাপন করিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের ভিতরে ভিতরে একটি মূলগত অপ্রত্যক্ষ যোগসূত্র রাখিয়া দিয়াছে।[৪৮]

ভারতীয় ইতিহাসের সেই অন্তর্ময় যোগসূত্রটি রচনা করেছে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ নয়, ধর্ম। ইউরোপ এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের রূপ ও স্বরূপের পার্থক্যও এ–সূত্রে নির্ধারিত হয়েছে। কেবল ইতিহাস নয়, দুই সভ্যতার রাষ্ট্র, জাতি, রাজনীতির চারিত্র্যধর্মও ব্যাখ্যা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ–প্রসঙ্গে ব্রিটিশ–কলোনিশাসিত ভারতবর্ষের জনগোষ্ঠীর ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হৃদয়ানুভূতিরই প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের আলোচনায়। তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষ তত্ত্বের সহিত কর্মের ভেদ–সাধন করে নাই। এই জন্য আমাদের দেশে কর্মই ধর্ম। ' পক্ষান্তরে 'য়ুরোপ কর্মকে কর্ম হইতে মুক্তির সোপান করে নাই, কর্মকেই লক্ষ্য করিয়াছে।··· য়ুরোপের ইতিহাস কর্মেরই ইতিহাস।' এ–কারণেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপকরণ সন্ধানে ইউরোপীয় রীতিপদ্ধতির প্রয়োগ তিনি অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। ভারতীয় জীবনাদর্শের যে সমন্বিত রূপ রবীন্দ্রনাথের এ–পর্যায়ের ধর্মচেতনার মূলীভূত সত্য হিসেবে বিরাজমান ছিলো, এ–আলোচনায় তারও উপস্থিতি সুস্পষ্ট।

সাত

দীনেশচন্দ্র সেনের *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* গ্রন্থটি সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। দেশ–কালের পরিপ্রেক্ষিতে সর্ব–আয়তনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন গ্রন্থটিকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। *সাহিত্য* (১৩১৪) গ্রন্থের *বঙ্গভাষা ও সাহিত্য* শীর্ষক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সময়, সমাজ ও সাহিত্য–ভাবনার উন্মোচন ঘটেছে। গ্রন্থটি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ বাংলার সাহিত্য– ইতি–হাসের জটিল গ্রন্থিসমূহ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে আর্থ–সামাজিক– রাজনৈতিক ইতি – হাসের সকল প্রান্তকেই স্পর্শ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসজ্ঞান যে কত গভীর ও ব্যাপক ছিলো, উল্লিখিত আলোচনা তার প্রমাণ। আমাদের ইতিহাসের শক্তিদ্বন্দ্ব,

ধর্মদ্বন্দ্ব প্রভৃতির স্বরূপ যেমন তিনি নির্নয় করেছেন, তেমনি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বিধৃত দেবদ্বন্দ্বের সাথে সমাজসত্যের নিগূঢ় যোগসূত্র নির্ধারণ করেছেন। যেমন,

১. আমাদের চক্ষে বঙ্গসাহিত্যমঞ্চের প্রথম যবনিকাটি যখন উঠিয়া গেল তখন দেখি সমানে একটি কলহ বাধিয়াছে, সে দেবতার কলহ। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থখানির পঞ্চম অধ্যায়ে দীনেশবাবু প্রাচীন শিবের প্রতি চণ্ডী বিষহরি ও শীতলার আক্রমণব্যাপার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। এই-সকল স্থানীয় দেবদেবীরা জনসাধারণের কাছে বল পাইয়া কিরূপ দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদের ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায়।[৪৯]

২. শাক্ত যে পূজা অবলম্বন করিয়াছিল তাহা তখনকার কালের অনুগামী। অর্থাৎ সামাজে তখন যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, যে শক্তির খেলা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ হইতেছিল, যে-সকল আকস্মিক উত্থানপতন লোককে প্রবল বেগে চকিত করিয়া দিতেছিল, মনে মনে তাহাকেই দেবত্ব দিয়া শাক্তধর্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।[৫০]

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-অন্বেষণে রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনার আত্যন্তিক ব্যাপ্তি ও গভীরতা মাঝে মাঝে বিস্ময়কর বলেই মনে হয়। ব্রিটিশ কলোনিশাসিত সমাজ-শৃঙ্খল থেকে শাক্তযুগের মঙ্গলকাব্যসমূহকে যখন প্রত্যক্ষ করেন, তখন তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি সমাজসত্যের গভীরতল স্পর্শ করে যায়ঃ 'সমাজ যখন নিজের চর্তুদিগ্‌বর্তী বেষ্টনের মধ্যে, নিজের বর্তমান অবস্থার মধ্যেই সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ থাকে, তখনো সে বসিয়া বসিয়া আপনার সেই অবস্থাকে কল্পনার দ্বারা দেবত্ব দিয়া মণ্ডিত করিতে চেষ্টা করে। সে যেন কারাগারের ভিত্তিতে ছবি আঁকিয়া কারাগারকে প্রাসাদের মতো সাজাইতে চেষ্টা পায়।'[৫১] এভাবেই রবীন্দ্রমন ও মনন নতুন বিষয়ের আকর্ষণে দীপ্তিমান হয়ে ওঠে।

কবিজীবনী বৃহৎ দুই খণ্ডে প্রকাশিত আলফেড টেনিসনের চিঠিপত্র ও জীবনীর ওপর আলোচনা। কবি ও তাঁর জীবনের যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক, সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব এ-ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট। এই গ্রন্থ অধ্যয়নের মনস্তত্ত্ব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথঃ

অনেক ভ্রমণকারী বড়ো বড়ো নদীর উৎস খুঁজিতে দুর্গম স্থানে গিয়াছে। বড়ো কাব্যনদীর উৎস খুঁজিতেও কৌতূহল হয়। আধুনিক কবির জীবন-চরিতে এই কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে এমন আশা মনে জন্মে। মনে হয় আধুনিক সমাজে কবির আর লুকাইবার স্থান নাই; কাব্যস্রোতের উৎপত্তি যে শিখরে সে পর্যন্ত রেলগাড়ি চলিতেছে।[৫২]

রবীন্দ্রনাথের কাছে কবির জীবন অপেক্ষা তাঁর সৃষ্টিই যে বড়ো, অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কবি-জীবনসত্যই অন্বিষ্ট। 'কবি কোথায়, কাব্যস্রোত কোন্ গুহা হইতে প্রবাহিত হইতেছে'—চিঠিপত্র ও জীবনীতে তার পরিচয় নেই। বাল্মীকি, কলিদাস ও দান্তের জীবন ও সৃষ্টির আলোচনাসূত্রে রবীন্দ্রনাথ এ-সত্যই প্রতিষ্ঠা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'দান্তের কাব্যে দান্তের জীবন জড়িত হইয়া আছে, উভয়কে একত্রে পাঠ করিলে জীবন এবং কাব্যের মর্যাদা বেশি করিয়া দেখা যায়।'

অথবা 'বাল্মীকি সম্বন্ধে যে-গল্প প্রচলিত আছে তাহাকে ইতিহাস বলিয়া কেহই গণ্য করিবেন না। কিন্তু আমাদের মতে তাহাই কবির প্রকৃত ইতিবৃত্ত।' এ-জন্যেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, টেনিসনের কাব্যগত জীবনচরিত যদি রচনা করা হয়, বাস্তবজীবনের পক্ষে তা অমূলক হলেও কাব্যজীবনের পক্ষে তা সমূলক হতে বাধ্য।

উপমহাদেশে প্রাচ্যদেশাভিমানের প্রবল হাওয়ায় *জন্ চীনাম্যানের পত্র* বইখানি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করে। কেমব্রিজের কলেজ-ভবনে পরবর্তীকালে লোয়েস ডিকিন্সন নামক একজন অধ্যাপকের বাড়িতে তিনি দুই দিন অবস্থান করেছিলেন। তিনিই *জন্ চীনাম্যানের পত্র* গ্রন্থটির রচয়িতা। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তখন জানিতাম, সে বইখানি সত্যই চীনাম্যানের লেখা। যিনি লেখক তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি চীনাম্যান নহেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি ভাবুক, অতএব তিনি সকল দেশের মানুষ।' [৫৩]

চীনেম্যানের চিঠি আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ 'এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে একটি গভীর ও বৃহৎ ঐক্য' প্রত্যক্ষ করেছেন। পাশ্চাত্যের বস্তু ও শক্তিপ্রধানবণিকী সভ্যতার পটভূমিতে এশীয় সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন এ-আলোচনায়। ভারতবর্ষকে কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই তিনি সীমাবদ্ধ করে দেখেন নি, বিশ্বপটভূমির আলোকে তার স্বরূপ অবলোকন করেছেন। এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অনুভব অনুসরণযোগ্য:

> সম্প্রতি আমাদের মধ্যে একটা চঞ্চলতা জন্মিয়াছে; আমাদের স্বাধীন শক্তি—আমাদের চিরকালের শক্তি কোন্‌খানে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহাই সন্ধান করিয়া সেইখানে আশ্রয় লইবার জন্য আমাদের মধ্যে একটা চেষ্টা জাগিয়াছে। বিদেশীর সহিত আমাদের সংঘাত ক্রমশ যতই কঠিন হইয়া উঠিতেছে স্বদেশকে ততই বিশেষভাবে জানিবার ও পাইবার জন্য আমাদের একটা ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিতেছে।...য়ুরোপের সংঘাত সমস্ত সভ্য এশিয়াকে সজাগ করিতেছে। [৫৪]

গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অংশসমূহের অনুবাদ আলোচনার প্রাসঙ্গিকতাকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষের সমাজবিন্যাসের রূপ, তার অন্তসন্ধান ও সত্তাসন্ধানের কাঙ্ক্ষিত দিক্‌নির্দেশনা বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নেই (১৯০২) আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ-ক্ষেত্রেও *চীনাম্যানের পত্র* উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের সময়-ও সমাজবোধের প্রকাশ।

কালান্তর গ্রন্থ-অর্ন্তভুক্ত *রায়তের কথা* প্রমথ চৌধুরীর *রায়তের কথা* (১৯২৬) গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে মুদ্রিত হয়েছিলো। এ-আলোচনায় জমিদার ও শিল্পী রবীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্বময় চৈতন্য যেমন আমরা উপলব্ধি করতে পারি, তেমনি জমিদার-তন্ত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ-পর্যায়ের ভাবনারাশিও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে:

> আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক; সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব।' [৫৫]

রায়তের কথা আলোচনাটি পরিচয়, বিচার বা ব্যাখ্যা—কোন পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত নয়। জমিদারতন্ত্রের অন্তর্গত শূন্যতা ও ক্ষয়কে প্রত্যক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। জমিদারির ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে নতুন যে সমাজবিন্যাসের ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ প্রদান করেছেন, তার নিহিত সত্য আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনে আজও অনুসরণীয়: 'যে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই-যে বাঁচাবার শক্তি তা জীবনযাত্রার সমগ্রতার মধ্যে।...পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হলে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।' [৫৬]

সাহিত্যের পথে (১৩৪৩) গ্রন্থ-অন্তর্ভূত *রূপশিল্প* রবীন্দ্রনাথের জীবন ও শিল্পাবোধের নতুন মাত্রার উন্মোচনে গৌরবময়। অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর চিত্রকলাবিষয়ক গ্রন্থ *রূপশিল্প*। আমরা জানি, চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথও বিশ্বদৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর চিত্ররীতি পাশ্চাত্য জগতে নতুনত্বের বিস্ময় জাগ্রত করেছিলো। এ-আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলাবিষয়ক অনুভব ও দৃষ্টিভঙ্গির বিন্যাস ঘটেছে।

বিচারমুখ্য এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রকলার স্বকীয় রহস্য' আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন—কখনো গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গির অনুসরণে, আবার কখনো-বা বক্তব্য প্রমাণের প্রয়োজনে। যেমন,

> প্রকৃতির কারখানা-ঘরে সমাপ্ত রূপের কীর্তি যত আছে তার চেয়ে অনেক আছে অপূর্ণ রূপের ইঙ্গিত। আছে তা মেঘের স্তরে, পাতার স্তবকে, জলের হিল্লোলে। তা ছাড়া সমাপ্ত সৃষ্টির থেকেও উপচে পড়ছে ইঙ্গিত, সাপের ফণায়, পাখির পেখমে, বলাকার উড়ে চলায়। ... তাদের মধ্যে রেখায় বর্ণে ভঙ্গিতে রয়ে গেছে সৃষ্টির অর্থসংকেত। এই-সব অর্থ ধরা পড়ে রূপকারের চোখে। [৫৭]

উপর্যুক্ত অংশে রবীন্দ্র-অনুভূতিতে বিচিত্র রূপ ও রঙের প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতা-অন্বেষী মন এ-ক্ষেত্রেও সক্রিয়। তাঁর মতে, 'শিল্পের পরম মূল্য তার নিজের পূর্ণতাতেই।' শিল্প-সাহিত্যের বিচিত্র উৎস-আহরিত দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নকে পরিপূর্ণতা দান করেছে।

আট

সৃজন-মননের এক অবিচ্ছেদ্য সূত্রে জড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের সমালোচক মানস। কবিতায় চৈতন্যের মগ্নস্তর থেকে স্তরান্তরে কবির যে অভিযাত্রা, সমালোচনার মাধ্যমে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছিলো দেশ-কালের বিশাল পটভূমি-তে, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি-রাজনীতি-সমাজনীতির বিচিত্র উৎস-লোকে। সেই বিশাল সমালোচনাজগতের মাঝখানে বনস্পতির মতো দাঁড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-আলোচনাসমূহ। নিঃসঙ্গচারী শিল্পকর্ম হিসেবে নয়, এক অন্তর্ময় যোগাযোগের

সেতুবন্ধন সেখানে রচিত হয়েছিলো গোড়া থেকেই, শিল্পীস্বভাবের মৌল তাগিদে। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-আলোচনাসমূহে বিভিন্ন রীতির প্রয়োগ ঘটলেও নির্মাণের প্রতি তাঁর অনাগ্রহ সুস্পষ্ট। সমালোচনার ধর্ম বস্তুনিষ্ঠ, তথ্য, তত্ত্ব ও যুক্তিবিচার-কেন্দ্রিক হলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবী আয়োজনেই এর রূপ ও রীতিতে নতুন বৈশিষ্ট্য আরোপ করেছিলেন। যে-কারণে এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজেই নিজের দৃষ্টান্তে পরিণত হন। সূচনালগ্ন থেকে শেষ আলোচনা পর্যন্ত রবীন্দ্রমন ও মননের গতি ও বৈচিত্র্যের সাথে যুক্ত হয়েছে সময় ও সমাজবোধ, জীবন ও মানবভাবনা। ফলে, প্রয়োজনের হাত পরিণত হয়েছে শিল্পীর হাতে, প্রয়োজনের নির্মিতিও অর্জন করেছে চিরন্তন শিল্পবৈশিষ্ট্য।

তথ্যনির্দেশ

১ সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, তৃতীয় খণ্ড, *রবীন্দ্রনাথ* (চতুর্থ সংস্করণ ১৩৭৬, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা), পৃষ্ঠা ৪৬০

২ অমলেন্দু বসু, 'সমালোচনার পদ্ধতি', *সাহিত্যচিন্তা* (প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৯, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা), পৃ. ৫১

৩ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ* (প্রথম দে'জ সংস্করণ, ১৯৯০, দে'জ পাবলিশিং কলিকাতা), পৃ. ৩১

৪ উদ্ধৃত, সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬১

৫ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬০

৬ ভবতোষ দত্ত, 'সাময়িক পত্র সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথ' *রবীন্দ্রচিন্তাচর্চা* (১৯৮২, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা), পৃ. ১৭৭-১৭৮

৭ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

৮ পূর্বোক্ত

৯ 'মেঘনাদবধ কাব্য' *সমালোচনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী;* অচলিত সংগ্রহ: দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৮২, বিশ্বভারতী, কলিকাতা), পৃ.৭৭

১০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮

১১ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১

১২ 'সাহিত্যবিচার', *সাহিত্যের পথে* (১৩৮৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলিকাতা), পৃ. ১০০

১৩ 'সাহিত্যের বিচারক', *সাহিত্য* (১৩৯২, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলিকাতা), পৃ. ২৮-২৯

১৪ 'সাহিত্যবিচার', *সাহিত্যের স্বরূপ* (১৩৯৫, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলিকাতা), পৃ.৪৪

১৫ *সাহিত্যের পথে,* পূর্বোক্ত, 'গ্রন্থপরিচয়' অংশ দ্রষ্টব্য, পৃ. ২৮০

১৬ সমালোচক *আধুনিক সাহিত্য* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করলেও, বর্তমান সংস্করণে প্রবন্ধটি নেই। দ্র. ভবতোষ দত্ত, *রবীন্দ্রচিন্তাচর্চা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

১৭ বিশ্লেষণসূত্রে সমালোচক এ-আলোচনাটির উল্লেখ করেছেন, রচয়িতার নামের উল্লেখ নেই, দ্র. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, *সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১

১৮ 'বাংলা গদ্য ও রবীন্দ্রনাথ', ভবতোষ দত্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭

১৯ সঞ্জীবচন্দ্র [পালামৌ] *আধুনিক সাহিত্য* (১৩৯৪, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলিকাতা), পৃ. ৫৪–৫৫

২০ পূর্বোক্ত পৃ. ৬৩

২১ 'কৃষ্ণচরিত্র', *আধুনিক সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ.৭১

২২ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯

২৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

২৪ ভবতোষ দত্ত, 'জগত যত মহৎ আছে', *রবীন্দ্রচিন্তাচর্চা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

২৫ 'রাজসিংহ', *আধুনিক সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

২৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

২৭ পূর্বোক্ত

২৮ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২

২৯ সৈয়দ আকরম হোসেন, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস: চেতনালোক ও শিল্পরূপ* (প্রথম প্রকাশ ১৩৮৮, পুর্নমুদ্রণ ১৩৯৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা), পৃ. ৫৭–৫৮

৩০ 'ফুলজানি', *আধুনিক সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ.১০৫

৩১ দ্রষ্টব্য–*ছিন্নপত্র*, পত্র নং ৪ ও ৫ (১৩৭০, বিশ্বভারতী, কলিকাতা)

৩২ 'যুগান্তর', *আধুনিক সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ.১১১

৩৩ পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২–১১৩

৩৪ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১

৩৫ 'আর্যগাথা', *আধুনিক সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৮

৩৬ 'মন্ত্র', *আধুনিক সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮–২৯

৩৭ 'মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস', *আধুনিক সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭

৩৮ 'সাকার ও নিরাকার', *আধুনিক সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২

৩৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

৪০ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, 'বাংলা গদ্য ও রবীন্দ্রনাথ', *রবীন্দ্রচিন্তাচর্চা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

৪১ 'রামায়ণ', *প্রাচীন সাহিত্য* (১৩৯৫, বিশ্বভারতী , কলিকাতা), পৃ. ৭

৪২ সত্যেন্দ্রনাথ রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭

৪৩ 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', *প্রাচীন সাহিত্য*, পৃ. ৩০–৩১

৪৪ 'শকুন্তলা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

৪৫ ভবতোষ দত্ত, 'রবীন্দ্রনাথ ও শেক্সপীয়র', *রবীন্দ্রচিন্তাচর্চা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

৪৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

৪৭ 'কাদম্বরীচিত্র', *প্রাচীন সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

৪৮ 'ধম্মপদং', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪
৪৯ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', *সাহিত্য* (১৩৯২, বিশ্বভারতী, কলিকাতা), পৃ. ১৪৫
৫০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২
৫১ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪
৫২ 'কবিজীবনী', *সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩
৫৩ *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, কার্তিক ১৩১৯; দ্র. 'গ্রন্থপরিচয়' *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড (১৩৭২, বিশ্বভারতী, কলিকাতা), পৃ. ৫৫৯
৫৪ 'চীনেম্যানের চিঠি', *ভারতবর্ষ*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড (১৩৭২, বিশ্বভারতী, কলিকাতা), পৃ. ৪০৩
৫৫ 'রায়তের কথা', *কালান্তর*, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, চর্তুবিংশ খণ্ড (১৩৬৫, বিশ্বভারতী, কলিকাতা), পৃ. ৪২৭
৫৬ পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩০
৫৭ 'রূপশিল্প' *সাহিত্যের পথে* (১৩৮৮, বিশ্বভারতী, কলিকাতা), পৃ. ২৫৪